পরিবেশগত সংকট ও পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

কালিপদ মাইতি এবং পাপিয়া গুপ্ত

সংক্ষিপ্তসার: আধুনিক সভ্যতার চরম সংকট হল বিলুপ্তির সমস্যা (extinction crisis)। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্ন কৌশলে কাজে লাগিয়ে বা আরও স্পষ্টভাবে বললে প্রাকৃতিক সম্পদকে অতিরিক্ত মাত্রায় শোষণ করে পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়ার রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন তথা পৃথিবীর উত্তাপগত ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে চলেছে। প্রকৃতি বা পরিবেশ থেকে ততটাই গ্রহণ করা উচিত যতটা তার জীবনধারণের পক্ষে উপযোগী বা কার্যকরী — এই মৌলিক ভাবনাকে অতিক্রম করে মানুষ সীমাহীন স্বার্থপরতায় প্রাকৃতিক সম্পদকে নিঃশেষে শোষণ করে চলেছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণ নির্ভর করে পরিবেশের উপাদান সমূহের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অভিন্ন নয়। প্রাচ্যের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তার গভীর টান অনুভব করেছে। তাই তারা প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করেছে নির্বিবাদে। পাশ্চাত্যের মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করেছে প্রকৃতির ভোক্তা হিসাবে, চেষ্টা করেছে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার। এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে ধর্মনীতি এবং দর্শন উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রবন্ধে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ : প্রকৃতির সংকট, প্রকৃতির ধ্বংসকরণ, আত্মীয়তার গভীর টান, প্রভুত্বের সম্পর্ক, নীতিবিদ্যার প্রতিস্থাপন, ভাবী প্রজন্মের প্রতি ভালোবাসা।

সমস্ত জীবকুল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতি ও জীবকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক এতটা একপেশে বা কেবলমাত্র নির্ভরশীলতার নয়। জীবকুলের প্রতিটি উপাদান প্রকৃতির অংশ হিসাবে পরস্পরের উপরেও নির্ভরশীল। প্রতিটি জীব অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতি ও তার পরিবর্তনের সঙ্গে নিরন্তর অভিযোজনের মধ্য দিয়ে যায়। অভিযোজনের এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জীব এক দিকে যেমন নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানানসই করে তোলে তেমনি নিজের পরিবেশকেও পরিমার্জিত (Modify) করে। অভিযোজনের এই প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক এবং নিরন্তর একটি প্রক্রিয়া। কেবলমাত্র মানুষ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক উপলব্ধির সচেতন প্রয়াস চালিয়েছে। এই অনুসন্ধানের পথে সে কখনো নিজেকে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উপলব্ধি করেছে; আবার কখনো প্রকৃতির অধিপতি বা ভোক্তা হিসাবে নিজেকে নির্ণয় করেছে। আধুনিক মানুষ কেবল নিজেকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বা উপভোক্তা জেনেই সন্তুষ্ট নয়, সে নিজেকে প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র সে তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব। তার এই সর্বগ্রাসী প্রয়াসে প্রকৃতি আজ অতিদ্রুততায় পরিবর্তিত হচ্ছে। জীবকুল এই দ্রুতলয়ে নিজেকে অভিযোজিত করতে অসমর্থ হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আরো দ্রুতলয়ে। মানুষের অস্তিত্বও আজ সংকটাপন্ন। সুখের কথা এই যে মানুষ এই সংকট আজ উপলব্ধি করেছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। অপর্যাপ্ত হলেও একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তবে এই প্রয়াস সর্বাত্মক নয়। বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার সমাধানের আগে প্রয়োজন পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয় তার সচেতন প্রয়াস। বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে রাষ্ট্রীয় সীমানার বেড়াজালে বিভক্ত বিশ্বে অর্থনৈতিক অসাম্য সর্বব্যাপী। প্রতিটি মানুষ আজ অধিক আর্থিক সামর্থ্য লাভের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত। তাই বিশ্বজনীন এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক প্রয়াস আজও অপেক্ষিত। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত ভাবনার (attitude towards nature) বিকাশের বিভিন্ন ধারার একটি তুলনামূলক

মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। 'Nature' বা 'প্রকৃতি' কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে 'Nature' বা 'প্রকৃতি' বলতে কেবল সজীব উদ্ভিদ বা প্রাণীকূলকে বুঝব না। প্রকৃতি বলতে আমরা মানুষের নাগালে থাকা সকল প্রাণ এবং অপ্রাণ উপাদান সমূহকে বুঝাবো। যাদের মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার বা রূপান্তর করতে সক্ষম। মানব প্রজাতির অস্তিত্বে সংকট কেবলমাত্র জীবকুলের প্রতি তার আচরণের জন্য উপস্থিত হয়নি। আবার ব্রহ্মাণ্ডের যে অনন্ত বিস্তার, মানুষের নাগালের বাইরে তার সাথে বর্তমান সমস্যার কোনো প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক নেই। তাই বর্তমান আলোচনায় প্রকৃতি কথাটিকে আমরা বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করবো।

মানুষের প্রকৃতি-সংক্রান্ত ধারণার বিকাশের প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে প্রাচ্যের প্রকৃতি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের প্রকৃতির প্রতি মনোভাব তার ধর্মীয় চেতনার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। প্রাচ্যের প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ভাবনার উৎস অনুসন্ধান করতে হলে বৈদিক সাহিত্য এবং পুরাণ প্রভৃতির শিক্ষা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করা জরুরি। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের মানব-কেন্দ্রিক ভাবনার বীজ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই প্রোথিত ছিল।[১]

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তথা জীবনচর্যায় পরিবেশের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতা অতিপ্রাচীন কাল থেকেই প্রতিফলিত তথা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দার্শনিক বোধে সমৃদ্ধ ভারতীয় মনন তাই পরিবেশের সঙ্গে মানুষের এক নিবিড়, নিটোল আত্মীয়তার বন্ধনকে অনুভব করেছে যার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাকাব্য থেকে অর্থশাস্ত্র পর্যন্ত। এই 'পরিবেশে'র সদস্য যেমন মনুষ্য প্রজাতিসহ অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীকূল, তেমনি গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, প্রস্তর, নদী, পর্বতাদি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষ হলো বৃহত্তর পৃথিবীর একটি অংশমাত্র এবং মানুষ ও প্রকৃতি তথা পরিবেশ পরস্পরের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। অথর্ব সংহিতায় ভূমি তথা ধরিত্রীকে 'মা' ও মানুষকে তার সন্তানরূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে — "মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ"[২], কারণ আমাদের জীবন ও দীর্ঘায়ু তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হতে পারে — "সা নো ভূমিঃ প্রাণমায়ুদধাতু"[৩]। অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক ভারতীয় চিন্তাধারায় এমন এক মমতাপূর্ণ, স্নেহসিক্ত, সহমর্মিতার সম্পর্কের রূপ ধারণ করেছে যার প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মাতা-সন্তানের এই অনাবিল ভালোবাসার অন্তহীন ফল্গুধারা।

সম্পর্কের অন্তরঙ্গতায় প্রিয়জনের মঙ্গলের প্রতি শুভ সচেতনতা যেমন পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তেমনি তাকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্বও আন্তরিকভাবে অনুভূত হয়। এবং সেই কারণেই মাতা ধরিত্রীর বুকে হলকর্ষণের জন্য মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা করে। "মা তে মর্ম বিমৃগ্ববি মা তে হৃদেয়মপিনম্"[৪] মনুসংহিতাতে উচ্চারিত হয় নিষেধবাণী ব্রাহ্মণদের প্রতি হলকর্ষণ প্রসঙ্গে, কারণ এর ফলস্বরূপ বহু কীটপতঙ্গের জীবনহানি হয় — "ভূমিঃ ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োসুখম"[৫]। এ ধরণী শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয় বরং অন্য সমস্ত কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখীরও আবাসস্থল যারা এই ব্রহ্মাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য— "ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদঃ ত্বং চতুষ্পদ"[৬]। হিন্দু পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর যে দশ অবতারের বর্ণনা আছে যেমন — মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি তার মধ্য দিয়েও বিভিন্ন প্রাণীর ঐশ্বরিক রূপ-ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাতে তাদের অস্তিত্ব ধর্মীয় বিধির বেড়াজালে সুরক্ষিত হতে পারে।

আধুনিককালে সমগ্র বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করেছে বৃক্ষ রাজির গুরুত্ব যা পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এক অন্যতম উপাদান বা শর্ত। যে কারণে বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে পালিত হচ্ছে অরণ্যসপ্তাহ। বৈদিক যুগে কিন্তু এই সচেতনতার মাত্রা এতটাই জোরালো ছিল যে তখন প্রকৃতিকে অত্যন্ত সংযমের সাথে, বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা হত এবং বৃক্ষের ওপর কখনো মানুষ, কখনো বা দেবতার রূপ আরোপ করা হত। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনার মধ্যে অনুরণিত হয় সেই ভাবনা — অরণ্য থেকে তরুকে এবং পিতার নিকট থেকে যেন পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়। এমনকি প্রয়োজনের নিমিত্ত যদি বৃক্ষছেদন প্রয়োজনও হয় তাহলেও যেন তা শীঘ্র পুনর্জাত হয় সেই প্রার্থনাও ধ্বনিত হয় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে — "যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রংতদপি রোহতি"[৭]। মনু ওষধি, বনস্পতি, বৃক্ষাদিতে চেতনার অস্তিত্ব অনুভব করে বলেছেন যে বস্তুতঃ তমোগুণের প্রভাববশতঃ ঐ চেতনা দৃষ্ট হয় না – "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"[৮], অতএব তাদের আঘাত করলে

তারাও যন্ত্রণা অনুভব করে। তাই জ্বালানির প্রয়োজনে জীবন্ত বৃক্ষ ছেদনকে মনু পাতকোচিত কর্ম বলে অভিহিত করেছেন — "ইন্ধনার্থম্ অশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনম্"[৯] পুরাণেও বৃক্ষ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে বলা হয়েছে —"দশপুত্রসমো দ্রুমঃ"[১০] অর্থাৎ একটি বৃক্ষ দশটি পুত্রের সমান প্রাচীন সাহিত্যেও পরিবেশের প্রতি এই নিবিড় আত্মীয়তার বোধ প্রকাশিত হয়েছে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম-এ নায়িকা শকুন্তলার বৃক্ষের প্রতি ছিল অপরিসীম স্নেহ ও যত্ন। বৃক্ষ মূলে বারিসেচন না করে তিনি কখনো জলগ্রহণ করতেন না। ভালোবেসেও কখনো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে অঙ্গসজ্জা করতেন না বরং বৃক্ষে যখন পুষ্পসমাগম হতো তখন তার অন্তর উৎসবের উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতো।

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মা স্বীপীতেষু যা।।

নাদত্তে প্রিয়শুনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।।"[১১]

বৈদিক সমাজ শুধুমাত্র বিধি নিষেধ করেই ক্ষান্ত হন নি এই বিধি লঙ্ঘনে কি শাস্তি বা পাপ হতে পারে সে বিষয়েও শাস্ত্রীয় বিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনুর মত অনুসারে বাঁধ নির্মাণ করে বা অন্য উপায়ে বহমান জলের স্রোতকে অন্যমুখী করা ঘোরতর অন্যায় এবং অপরাধীকে অপাংক্তেয়, দ্বিজাধম রূপে পরিত্যাগ করা উচিত —

"স্রোতসাং ভেদকো যশ্চ তেষাং চাবরণে রতঃ/

এতান্ বিগর্হিতাচারান অপাংক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।

... বিবর্জয়েৎ।।"[১২]

শুধু তাই নয়, জলাশয়, উদ্যান প্রভৃতি বিক্রয়, স্ত্রী, পুত্রকে বিক্রয় করার মতোই গর্হিত আচরণ এবং এমন আচরণকারী ব্যক্তি দোষী রূপেই সাব্যস্ত হবেন —"তড়াগরাম দারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ।।"[১৩] পরিবেশকে সুস্থ, দূষণমুক্ত রাখার জন্য মনুসংহিতায় পথ, গোচারণভূমি, চাষ দেওয়া জমি, জল, নদী তীর, দেবমন্দির, পর্বত শীর্ষ প্রভৃতি স্থানে মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ কর্ম রূপে উল্লিখিত হয়েছে —

"ন মূত্রং পথ কুর্বীত ন ভস্মানি ন গোব্রজে।।

ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে।

ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।

ন সসত্ত্বেষু গর্তেষু ন গচ্ছন্নপি চল স্থিতঃ।

ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্বতমস্তকে।।"[১৪]

জীব সংরক্ষণ প্রসঙ্গেও মনু স্পষ্টভাবে বিধি প্রদান করে বলেছেন যে, হস্তি, ঘোটক, গর্দভ, উট, হরিণ, মোষ, ভেড়া, মৎস্য, সর্প প্রভৃতিকে হত্যা করা সংকরীকরণ রূপে উপপাতকীয় কর্ম —

"খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামজাবিকবধস্তথা।

সংকরীকরণ নেয়ং মীনাহিমাহিযস্য চ ।।"[১৫]

অর্থশাস্ত্রেও কৌটিল্য গ্রামের সীমান্তে বা অন্য যথাযথ স্থানে মৃগবন নির্মাণ করে পশুদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিতকরণের

কথা উল্লেখ করে তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্যাধ, শবর, চণ্ডালদের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলেছেন—

"সর্বাতিথিমৃগং প্রত্যন্তে চাণ্য শৃগবনং ভূমিবশেন বা নিবেশয়েৎ।"[১৬]

কৌটিল্যের মতে গাইগরু, ষাড়, বাছুর কোনভাবেই হত্যা করা যাবে না — "বৎসা বৃষো ধেনুশ্চৈষাম্ অবধ্যাঃ।।"[১৭] এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে কখনো নৈতিক চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে, কখনো বা পাপ পুণ্যের ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা, কখণো বা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অবরোধের সাহায্যে পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখার বীজমন্ত্র মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। বিশ্বনিখিলের প্রতিটি অন্য সদস্যের প্রতি সে তার অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা, সম্মান, আনুগত্য প্রকাশ করেছে নিম্নোক্ত মন্ত্রে —

"যো দেবো অগ্নৌ মো অপ্র
যো বিশ্বঃ ভুবনমাবিবেশ
য ঔষধীষু মো বনস্পতিসু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"[১৮]

অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি তৃণতরুময় স্থলেতে, যিনি সমগ্র ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিসমূহে, বনস্পতি সমূহে অবস্থিত, তাকে বারংবার প্রণাম করি।

তাৎপর্য্য হলো সেই এক ব্রহ্ম বা দেবতাই অগ্নি, জল, বৃক্ষ থেকে ক্ষুদ্র গুল্মরাজি, বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান — অতএব প্রত্যেকেই ঈশ্বরের বা সেই ব্রহ্মের প্রকাশ এবং শ্রদ্ধেয় তথা প্রণম্য। বস্তুতঃ বৈদিক ঋষির দর্শন খণ্ডকে অতিক্রম করে অখণ্ডের পিয়াসী যা তাঁদের বিশ্বসংহতির ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে সর্বদা সর্বপ্রাণী, সর্বধর্ম, সর্বমসর্বের মঙ্গলকামনায় রত করে। বস্তুতঃ পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তু ও জীব স্বয়ং সেই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, এই সত্য জানলে সবই আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হবে। তিনি সর্বদাই আমাদের সাথে আছেন এবং পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাতে তিনি বিদ্যমান, এই উপলব্ধি হলে দুঃখময় পৃথিবী মধুময়রূপে অনুভূত হয় —

"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতাণাং ম বস্যৈ পৃথিব্যৈ
সর্বাণি ভূতানি মধুযশ্চয়মস্যাং
পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং,
শরীরস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেত স
সোহয়মাত্মেদমমতৃমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম।।"[১৯]

এই বোধ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে এক পরমাত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে —"বসুধৈব কুটুম্বকম" এবং পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে আকাশ, বাতাস, নদী, ঔষধি, বনস্পতি, প্রাণীসম্পদ সর্বত্র, সর্বস্থানে সেই আনন্দময় মধুসত্তা অনুভব করে। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণুর জন্য এমনকি সেই পরম ব্রহ্মের জন্য শান্তি কামনা করে —

"ওঁ দৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তিবিশ্বেদেবাঃ শার্ন্তিব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্ব শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরোধি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।"[২০]

সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের মানব-কেন্দ্রিক ভাবনাকে বর্তমান বিপদের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 'জেনেসিস' বা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিকাশের একমাত্র উপকরণ বা নির্ণায়ক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্যে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব আছে। পাশ্চাত্য দর্শন, যা প্রাচীন কাল থেকেই গ্রীকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃতিকে তার আলোচ্য বিষয়সূচীর বাইরে রেখে ধর্মীয় বিশ্বাস নির্ভর ভাবনার বিকাশ ও প্রসারের পথ মসৃণ করেছে।[১৭] থেলস্-এর সময় থেকে দার্শনিকগণ বৈচিত্র্যময় বস্তুজগতের বাস্তবতায় আগ্রহ না দেখিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক বা মূল সত্তার অনুসন্ধান চালিয়েছে।

থেলস্, অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার, অ্যানাক্সিমেনস্, পারমেনিডস প্রমুখ দার্শনিকতার জগতের মূল উপাদান হিসাবে একটি মৌলিক উপাদান স্বীকার করেছেন। তবে সেই উপাদানের স্বরূপ বিষয়ে তারা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। থেলস্ কথিত 'জল' হল সসীম। অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার কথিত 'বাউণ্ডলেস্' বা অ্যানাক্সিমেনস্ বর্ণিত 'বায়ু' অথবা পারমেনিড্স কথিত 'এক' বা 'সত্তা' স্বরূপত অসীম। জেনোফেন্ পিথাগোরাস্, অ্যানাক্সাগোরস্, ডেমোক্রিটাস প্রমুখ স্বীকার করেছেন জগৎ একটিমাত্র মূল উপাদান থেকে সৃষ্ট নয়। জগৎ সৃষ্টির মূলে একাধিক উপাদান রয়েছে। তবে তারা এই বৈচিত্রময় জগতের পরিবর্তে জগতের মূল উপাদানের অনুসন্ধানে উৎসাহী ছিলেন। পিথাগোরাস চেষ্টা করেছেন সংখ্যাকে মূল উপাদান মেনে প্রকৃতি বা কসমস্ এর ব্যাখ্যা দিতে। হেরাক্লিটাস প্রথম পরিবর্তনশীল প্রকৃতির বাস্তবতা স্বীকার করেন। তিনি পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে নির্দিষ্ট গঠন বা ক্রমবিন্যাস লক্ষ্য করেছিলেন। তিনিও কিন্তু জগতের মূল উপাদানের সন্ধান চালিয়ে গেছেন। জেনো প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন গতি বা পরিবর্তন এবং একাধিক সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব।[১৯]

প্লেটো আরো খানিক এগিয়ে কল্পনা শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বাহ্যজগতের বাস্তবতা অস্বীকার করে সেই জগতের অতিবর্তী কল্পজগতের বাস্তবতা স্বীকারের মাধ্যমে। অ্যারিস্টটল কল্পজগতের বাস্তবতা অস্বীকার করে 'Forms' বা 'আকার' কে বাস্তব জগতে নামিয়ে আনেন। তাঁর কাছে জাগতিক বস্তু হল উপাদান এবং আকারের সমন্বয়। 'Forms' অস্তিত্ববান দুই অর্থে — ১. Actual Forms ২. Potential Forms। তিনি পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। Actual Forms এবং Potential Forms এর বাস্তব অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তনের বাস্তবতা আধুনিক বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছিল।[২০]

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারা — একদিকে যেমন প্রকৃতি চেতনার বিকাশে এবং প্রাকৃতিক জগতের নান্দনিক প্রশংসার অন্তরায় হয়েছে তেমনি তা বাস্তব জগতের যে কাল্পনিক চিত্রায়ণ ঘটিয়েছে তা প্রকৃতি সংরক্ষণের ভাবনার বিকাশের পরিপন্থী হয়েছে।[১৪] কেবলমাত্র অ্যারিস্টটল পেরেছিলেন প্রকৃতিকে জানতে, প্রয়াসী হতে। তবে তিনি 'শুদ্ধ অধিবিদ্যা' থেকে বেরিয়ে জীববিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যার প্রারম্ভিক কাজ করেছিলেন মাত্র, প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা বলেননি। তিনি মনে করতেন সমস্ত প্রাণকুল বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমান। তিনি বিভিন্ন প্রজাতির জীবের স্তরভেদ করেছেন, যে বিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তরে তিনি রেখেছেন মানুষকে এবং বলেছেন নিম্নস্তরের জীবের উদ্দেশ্য উচ্চস্তরের জীবের সুবিধার কারণ হওয়া অর্থাৎ সকল প্রাণকুলের লক্ষ্য মানুষের কাজে আসা। অ্যারিস্টটল-এর অনুগামী থিয়োফ্রাস্টাস এই তত্ত্ব অস্বীকার করে বলেন প্রতিটি প্রাণের বা উদ্ভিদের নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে এবং তারা মানুষের সেবা করার জন্য বা তাদের খাদ্য সরবরাহ করার জন্য সৃষ্ট হয় নি, যদিও তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি।[২১]

'জেনেসিস' বা 'ওল্ডটেস্টামেন্ট' অনুযায়ী ঈশ্বর জগত তৈরি করে সেই জগতের উপভোগের জন্য অ্যাডাম (প্রথম মানুষ) -কে তৈরি করেছেন। তিনি মানুষকে অধিকার দিয়েছেন প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন সাধনই হল সকল জীবের উদ্দেশ্য।[২৬] সকল আব্রাহামীকে ধর্মসম্প্রদায় এই সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করেছে। তাদের জীবনধারা এবং নীতিবোধ গড়ে উঠেছে এই বিশ্বাসের অনুসারী হিসাবে। তারা মনুষ্য ভিন্ন সকল সত্তার কেবল কৃতিসাধক মূল্য আরোপ করেছেন কিন্তু স্বতঃমূল্য অস্বীকার করেছেন। সত্তা সমূহের স্বতঃমূল্যের অ-স্বীকৃতি অনিবার্যভাবে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এবং

আচরণে প্রবৃত্ত করে।

প্রাচীনকাল থেকেই পাশ্চাত্য দর্শন প্রজ্ঞা এবং যুক্তি নির্ভর বলে দাবি করা হয়। তবুও তারা হোমার নির্মিত ধর্ম বিষয়ক ধারণা সমূহের বিষয়ে মৌন থেকেছেন। প্রাচীনকালে কেবল জেনোফেনকে দেখি 'নরাত্মারোপমূলক ধর্মতত্ত্ব' (anthropomorphic theology) এর বিরুদ্ধে সরব হতে।[২১] তিনি হোমারের ঈশ্বর এবং প্রকৃতি বিষয়ক বক্তব্যের বিরোধীতা করেন। হোমার ঈশ্বরের মধ্যে মনুষ্যসুলভ গুণাবলী আরোপ করেছিলেন। জেনোফনের বক্তব্য অনুযায়ী এই রূপ আরোপ শিশুসুলভ। মানুষের কল্পনায় ঈশ্বর মানুষের সদৃশ হলে পশুদের কল্পনায় ঈশ্বর তাদের মতন হবে। তাছাড়া জাতি এবং সংস্কৃতি ভেদে ঈশ্বরের অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন — ইথিওপিয়ানগণ মনে করেন তাদের ঈশ্বর খর্বনাসা ও কৃষ্ণকায়। কারণ থ্রেসিয়ানদের মতে দেবতাগণ নীলচোখ ও রক্তবর্ণ কেশের অধিকারী শুধু তাই নয়, হোমার দেবতাদের প্রতি সেইসব বৈশিষ্ট্য বা গুণ আরোপ করেছিলেন যা মানুষের ক্ষেত্রে নিন্দাসূচক ও নিষেধাত্মকরূপে বিবেচিত হয়- যেমন চৌর্য্য, ব্যভিচার এবং প্রতারণা প্রভৃতি।

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে এক অন্ধকার অধ্যায় ছিল। সেই সময়ে কোন মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটেনি। দার্শনিকরা ব্যস্ত ছিলেন প্রধানত দর্শন এবং খ্রীষ্টধর্মের ভাবনার সামঞ্জস্য প্রতিপাদনে। ধর্মযুদ্ধের শেষে মুসলিমদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। তাদের প্রভাবে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ উন্নতি ঘটতে থাকে। এই সময়েই বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা এবং প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটে।[২৮] পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে বেকন-এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সময়ে বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হলেও কিন্তু প্রকৃতি চেতনার বিকাশ ঘটেনি। ফলত পরিবেশগত সংকট ক্রমশ জটিল হয়েছে। বেকনের মতে — "Our main object is to make nature saved for the business of man" অর্থাৎ প্রকৃতিকে সর্বদা মানুষের প্রয়োজনার্থে ব্যবহার করতে হবেই। পাশ্চাত্যের মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আজকের পরিবেশগত সংকটের প্রধান কারণ হিসাবে দেখা হলেও জেনেসিস বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষার অনুকূলেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২৯] জেনেসিসে ঈশ্বর মানুষকে অধিকার দিয়েছেন প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে। মানুষ প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছে কিন্তু তাকে রূপান্তরিত করেনি। কার্তেজিয় দ্বৈতবাদের জনক ডেকার্ত যাকে আধুনিক দর্শনের জনক মানা হয় তিনি খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে সমগ্র জগৎ মানুষের ব্যবহারের জন্য এই ভাবনা শিশুসুলভ। জগতের বেশির ভাগ অংশ মানুষের নাগালের বাইরে তাই তা মানুষের ব্যবহারের জন্য হতে পারে না। তবে তিনি বলেন মানুষের নাগালে থাকা প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার রয়েছে প্রয়োজন এবং সুবিধা মতন রূপান্তর করে ব্যবহার করার।[৩০] তাঁর এই ব্যাখ্যা আধুনিক প্রযুক্তির বলে বলিয়ান দৈত্যের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। পরবর্তীকালে ফিকটের লেখার মধ্যেও প্রকৃতিকে দাস বানিয়ে তার ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর অহংকারী ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে — "I will be the lord of nature and she shall be my servant. I will influence her according to the measure of my capacity but she will have no influence on me."[৩১] উপনিবেশিকতার প্রভাবে এবং সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের হাত ধরে এই নীতি আজ বহুল প্রচলিত। ফলশ্রুতি বর্তমান সংকট।

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে মানব-কেন্দ্রিক ভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট। আধুনিক যুগের মাঝামাঝি সময়েও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের আচরণকে নৈতিক বিচারের অন্তর্গত করেন নি। জেরমি বেন্থাম ১৭৮০ সালে সকল প্রাণীর বেদনা অনুভব করার সামর্থের ভিত্তিতে তাদের নৈতিক বিবেচনা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।[৩২] অনেকেই বেন্থামের বক্তব্যের মধ্যে মানব-কেন্দ্রিকতার সুর খুঁজে পান। ১৯৯১ সালে জন্ রলস্টন সকল প্রাণীর এবং উদ্ভিদের মধ্যে টিকে থাকার প্রবণতার ভিত্তিতে তাদের নৈতিক বিবেচনার বিষয়ভুক্ত করেন।[৩৩] সেইসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রকে মানব-কেন্দ্রিকতার অভিযোগ থেকে খানিকটা হলেও অব্যাহতি পেতে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে পরিবেশ নীতিবিদ্যা ফলিত নীতিবিদ্যার একটি

শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতিরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত কর্মীরা পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের পরিবর্তে নূতন নীতিশাস্ত্র অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব রচনার দাবি তোলেন। তাদের জবাব দিতে জন পাসমোর দেখিয়েছেন সমস্যা নিঃসন্দেহে গুরুতর তবে তা পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা বা নীতিবিদ্যার অসারতা প্রমাণ করে না। তাঁর মতে নীতিবিদ্যার প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। এইরূপ প্রচেষ্টা কিছু যৌক্তিক, ব্যবহারিক এবং নৈতিক সমস্যার জন্ম দেয়। প্রকৃতির অবক্ষয় অনিবার্যভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ভয়াবহ সমস্যার জন্ম দেবে। আমাদের ভবিষ্যতও নিরাপদ নয়। ভাবী প্রজন্মের প্রতি ভালোবাসাই প্রকৃতি রক্ষার অনুপ্রাণিত করতে পারে।[৩৪] অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান এবং প্রকৃতির উপাদান সমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় গঠিত বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণেই মানব অস্তিত্ব নির্ভরশীল এই উপলব্ধি ভিত্তিক প্রকৃতিরক্ষার কর্মপ্রণালীই সংকট মুক্তির পথ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্বমঞ্চে পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন আশা জাগায় আমরা পারবো ভবিষ্যত প্রজন্মের ঋণ শোধ করতে। পাশাপাশি যখন দেখি সমগ্র প্রকৃতি ভাবনার বাইরে গিয়ে উপযোগমূল্য নির্ভর বাছাই করা উপাদান রক্ষার রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ তখন উদ্বেগ বাড়ে।

Notes and References

১. Lynn White, Jr: The Historical Root of our Ecological Crisis, *Science*, Volume 155, Number 3767, University of California, Los Angeles, 10th March 1967, p.1205.

২. অথর্বসংহিতা-১২/১/১২

৩. অথর্বসংহিতা-১২/১/১২

৪. অথর্ববেদ, ভূমিসূক্ত, ১২/১/৩৫/খ

৫. মনুসংহিতা — ১০/৮৪

৬. অথর্ববেদ — ১২/১/১৫

৭. অথর্ববেদ — ১২/১/৩৫

৮. মনুসংহিতা — ১/৪৯

৯. মনুসংহিতা — ১১/৬৪

১০. পদ্মপুরাণ — ১/৪৪/৪৫৫

১১. শকুন্তলা — ৪/৯

১২. মনুসংহিতা — ৩/১৬৩,১৬৭

১৩. মনুসংহিতা— ১/৬১

১৪. মনুসংহিতা — ৪/৪৫/৪৬/৪৭

১৫. মনুসংহিতা— ১১/৬৮

১৬. অর্থশাস্ত্র — ২/২

১৭. অর্থশাস্ত্র — ২/২৬

১৮. শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ — ২/১৭

১৯. বৃহদারণ্যক উপনিষৎ — ২/৫/১

২০. যর্জুবেদ — ৩৬/১৭

২১. Hargrove Eugene C., Foundation of Environmental Ethics, University of Georgia, Athens Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989, p. 15

২২. Copleston Frederick, S.J.: *A History of Philosophy*, Vol. 1, Image Books, Doubleday, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland, 1994, pp.55-56

২৩. Hargrove Eugene C., Foundation of Environmental Ethics, University of Georgia, Athens Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989, p. 21

২৪. Ibid, p. 21.

২৫. Ibid, p.25.

২৬. Lynn White, Jr: The Historical Root of our Ecological Crisis, *Science* Volume 155, Number 3767, University of California, Los Angeles, 10th March 1967, p 1206

২৭. James, Fieser and Norman, Lillegard: *A Historical Introduction to Philosophy,* University Press, New York, Oxford- 2002, p. 10

২৮. John, Passmore: Attitudes to Nature, *Nature and Conduct* (Ed. By R.S. Peters), New York: St. Martin's Press, 1975, 251-264, pp. 131

২৯. ibid, p. 132

৩০. ibid, p. 133

৩১. Fickte, J. G.: The Vocation of Man, Routledge, London, 1946, p. 29

৩২. Jeremy, Bentham: *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*- New edition, corrected by the author, 1823

৩৩. Rolston III, Holmes: "Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World", *Ecology, Economics, Ethics*: *The Broken Circle*, Ed. By F. Herbert Bormann and Stephen R. Kellert, els., Yale University Press, 1991 pp. 73-96

৩৪. John, Passmore: "Attitudes to Nature" *Nature and Conduct,* Ed. By R.S. Peters, St. Martin's Press, New York, 1975, 251-264, p. 131